কাব্যনাটক *নারীগণ* : ইতিহাস ও নারীবাদ প্রসঙ্গ

জান্নাত আরা সোহেলী[১]

সারসংক্ষেপ : একজন ইতিহাসমনস্ক লেখক হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিটি কাব্যনাটকে বাঙালি জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। কোনো কোনো কাব্যনাটকে ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি বাংলার সাধারণ জনগণের যাপিত জীবনের চিত্র, আর্থ-সামাজিক সংকট, মানস-দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-বৈষম্যের স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। আবার কোনো কোনো কাব্যনাটকে সমাজ ও রাজনীতি প্রধান উপজীব্য হলেও সেখানে ইতিহাসের ঘটনাংশ কার্যকারণসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক পলাশির বিয়োগবিধুর ইতিহাসকে আত্তীকৃত করে সম্পূর্ণ নারীবাদী দৃষ্টিকোণে তাঁর *নারীগণ* নাটকের বিষয়বস্তু সাজিয়েছেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের বাঁকবদলের বাস্তব উপস্থাপনায়, অবহেলিত নারীসমাজের মনোকথন বর্ণনায়, পরিবেশনরীতির নান্দনিকতায়, ভাষাপ্রয়োগের অনন্যতায় এ-নাটকটি হয়ে উঠেছে অসামান্য। বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক গবেষণারীতির প্রয়োগে *নারীগণ* নাটকে ব্যবহৃত ইতিহাসের ধারাক্রম এবং নারীবাদী দৃষ্টিকোণ অনুসন্ধানই আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Abstract : As a writer with a historical consciousness, Syed Shamsul Haque's literary oeuvre, particularly his poems and plays, deals with the socio-economic and cultural context of the bengalee identity. This historical sense is instrumental in his exploration of the themes of class conflict, class discrimination, and psychological crisis in the characters of his plays, who represent the ordinary bengalees and their life at large. However, in some plays where conflict and crisis are fictionalized, the realistic sense of history as a causally interconnected chain of events is also allowed to prevail. His play *Narigon* is an ideal example where the historical and fictional aspects have been converged. The tragic history of the Battle of palassy is reimagined to form the basis of a feministic representation. The play is regarded as a masterpiece for its unique way of documenting the transition of power, for its portrayal of women as a neglected entity in the power spectrum, and for its supremely aesthetic presentation. In this paper, an analytical and comparative approach is taken to study *Narigon* both from the historical and feminist perspectives.

চাবিশব্দ : সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাটক, নবাব শিরাজদ্দৌলা, পলাশির ইতিহাস, নারীবাদ

---

[১] পিএইচ. ডি, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; Email: sohelyjannat21@gmail.com

ভূমিকা

নারীগণ (২০০৬)[১] কাব্যনাটক সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) রচনা করেছেন ১৭৫৭ সালের পলাশির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। পলাশির রাজনৈতিক ইতিহাস কিংবা নবাব শিরাজদ্দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) ট্রাজিক কাহিনি বাঙালির অস্তিত্বলোকে গভীরভাবে প্রোথিত। এই ট্রাজিক চরিত্রকে নিয়ে বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে বহু চলচ্চিত্র ও নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* নাটকে তাঁর চিন্তাশক্তির অভিনবত্ব ও অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৭৫৭ সালের ঘটনা নিয়ে অন্যদের মতো ঐতিহাসিক দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা করেননি; বরং দেখিয়েছেন রাজনৈতিক অভিঘাতের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া; রাজমহলের নারীদের ওপর একটি যুদ্ধের অভিঘাতে কেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার স্বরূপ। বস্তুত, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিংবা বাংলা সাহিত্যে নবাব শিরাজদ্দৌলার শৌর্য-বীর্য, নবাব আলিবর্দি খাঁর ঔদার্য, মীরজাফর-জগৎশেঠদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি বহুভাবে চর্চিত হলেও তাদের অন্দরমহলের নারীরা বরাবরই থেকে গেছে অনালোচিত। অথচ নবাবের জীবনজুড়ে এসকল নারীর ভূমিকা কম ছিল না। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে নেপথ্যে রেখে রাজমহলের নারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাদের আকাঙ্ক্ষা-অচরিতার্থতা ও অন্তর্বেদনার প্রসঙ্গ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মূলত নারীবাদী আন্দোলনের ফসল। সাহিত্যবিচারের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিতে এবং সমাজে নারীদের সঠিক অবস্থান সুনির্ণয় ও সমুন্নত করার প্রয়োজন থেকে এ তত্ত্বের সৃষ্টি। নারীবাদ বা 'Feminism' শব্দটি ফরাসি 'Feminine' থেকে আগত। এ শব্দটির অর্থ 'নারী'। এর সাথে Ism প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'Feminism' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট (১৭৫৯-১৭৯৭) নারীবাদী চিন্তাধারার অন্যতম পথিকৃৎ বিবেচিত হলেও পরবর্তীকালে জেন অস্টিন (১৭৭৫-১৮১৭), ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১), সিমোন দ্য বোভোয়ারের (১৯০৮-১৯৮৬) মতো আরও অনেক দার্শনিক, লেখক নারীবাদী দর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বের বিকাশসাধন করেছেন। নারীবাদী দৃষ্টিকোণে মূলত একটি সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়– সেখানে উপস্থাপিত সমাজকাঠামোতে নারীর প্রকৃত অবস্থান কীরূপ। সৈয়দ শামসুল হকও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কিংবা বঞ্চনা নিয়ে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। আলোচ্য নাটকটি তাঁর সেই উন্নত চেতনারই শিল্পিত প্রয়াস। তার প্রমাণ– *নারীগণ* নাটকের আখ্যানভাগ লক্ষ করলে দেখা যাবে, "পুরুষের লোভ যেমন এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নারীতে নারীতে দ্বন্দ্বের জায়গাটিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার জেনানা মহলের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নারী জগতের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সৈয়দ হক।" (আলম, ২০১৭, পৃ. উল্লেখ নেই)। 'পালাকার' নাট্যদলের প্রযোজনায় এ-নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে। এই নাট্যদলের প্রচারপত্রে নাটকটি সম্পর্কে যে মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছিল তা এরকম :

> নবাব হত্যার পর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে নারীমহলে কী ঘটনা ঘটেছিল সেটা ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। এই সাহসী কাজটাই সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশের সব্যসাচী লেখক-কবি-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। [...] *নারীগণ* নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যার পর নবাব মহলের অন্তঃপুরে বন্দী নারীদের নানান উপলব্ধি। নবাব সিরাজের বন্দী নানি, মা, পত্নীর জবানে উঠে আসা তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ, নারীর মর্যাদা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ অনেক বিষয়। অবমাননার হাত থেকে বাঁচতে এই বন্দী নারীরা আত্মহত্যাও করতে পারে না। কারণ তাঁদের আত্মহননের পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অঙ্গুরির বিষ কেড়ে নেওয়া হয়, কেড়ে নেওয়া হয় খঞ্জর। প্রহরীর রূঢ় হাত তাদের শরীর স্পর্শ করে। তাঁদের বন্দী করার মধ্য দিয়েই ঘটনার শেষ হয় না। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে এবং বিদ্রোহের পথ রুদ্ধ করতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এইসব নারীকে হত্যা করা হয়। (তুলু, ২০১২, পৃ. উল্লেখ নেই)

গবেষণা-সমস্যা ও গবেষণা কাঠামো : সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *নারীগণ* নাটকটি পলাশির ট্রাজিক ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে রচনা করলেও তাঁর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতার পাশাপাশি নিজ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কারণ নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলো নবাব মহলের নারীদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন। ফলত গবেষণাকালে আমাদের একদিকে যেমন বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করে সেই সূত্রগুলির সত্যতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, তেমনিভাবে পলাশির ইতিহাস ও নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক প্রাসঙ্গিক আলোচনা যুক্ত করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা পাঠবিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি, বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি এবং তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। এসবকিছু প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো *নারীগণ* নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ ও সত্যতা যাচাই এবং তৎসঙ্গে নাট্যকারের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা বিশ্লেষণ।

_নারীগণ_ নাটকে ইতিহাস প্রসঙ্গ :

বস্তুত, “পলাশীর যুদ্ধের পিছনে ছিল মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষের ষড়যন্ত্র। সে চক্রান্তের সঙ্গে সুবাহ বাংলার জনজীবনের কোনো যোগ ছিল না। এর পিছনে কোনো গভীর নিহিত সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।” (রায়, ২১৪, পৃ. ১২)। ক্ষমতালুব্ধ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ষড়যন্ত্র, নবাব শিরাজদ্দৌলার আত্মীয়-অনুচরদের গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার শাসনপ্রক্রিয়ায় নেমে আসে সীমাহীন দুর্যোগ। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব শিরাজদ্দৌলার পতনের পর এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির শাসন-শোষণ শুরু হয়ে যায়। ইউরোপ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে আসা একটি অর্থনীতিনির্ভর কোম্পানি বাংলার শাসননীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া সামান্য ব্যাপার নয়। তবে বরাবরের মতোই এ রাজনীতি, এ ষড়যন্ত্র, পালাবদল সবকিছু পরিচালিত হয়েছে সমাজের উঁচুতলার মানুষের স্বার্থ ও প্রলোভনকে কেন্দ্র করে। এর সঙ্গে বাংলার সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে *নারীগণ* নাটকে ইতিহাসের এই

সত্যটি সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। আমিনা চরিত্রটির জবানিতে এ প্রসঙ্গটি সৈয়দ হক উল্লেখ করেছেন এভাবে :

নাকি এই রাজশক্তি আমাদের আসলে স্বৈরই ?
রাজপক্ষে প্রজা কেন থাকবে, দাঁড়াবে ?
কী আছে প্রজার লাভ– প্রজা মনে ভাবে।
তাই প্রজা সাধারণে এ রাজশক্তির
ভিত্তি তবে কিছুমাত্র ছিলো না কখনো ?
তাই কি মুর্শিদাবাদে যখন ক্লাইভ আসে পলাশীর পরে
মাত্র দু'শ গোরা সৈন্য নিয়ে–
লক্ষ লোক পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দ্যাখে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪০৭)

বাংলা সাহিত্যে একাধিক নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্র শিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) ও সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-১৯৭৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের রচিত নাটকে উপনিবেশিত সমাজব্যবস্থায় এদেশের মানুষের পরাধীনতা, দুর্দশাময় জীবনবাস্তবতা, জাতিগত ঐক্য, ঐতিহ্যপ্রীতি ও দেশপ্রেমের প্রকাশই ছিল নাট্যকারের মৌল অন্বিষ্ট। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে অগ্রজ কিংবা সমকালীন নাট্যকারদের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেননি। তিনি নাট্যকাহিনিতে শিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপুঙ্খ বৃত্তান্ত তুলে না ধরে বরং অন্দরমহলের নারীদের করুণ পরিণতি ও ভয়াবহতাকেই উপজীব্য করেছেন। এজন্য তিনি নাট্যপ্লটে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কল্পনার অসামান্য যোগ ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের মৌলসত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেলে *নারীগণ* হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী।

নবাব শিরাজদ্দৌলার পতনের পর তাঁর অন্দরমহলের নারীদের পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থ *সিয়ারুল মুতাখখেরিনে*র লেখক গোলাম হোসাইন তাবাতাবাইন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, শিরাজকে হত্যার পর মীরজাফর ও মীরন, তাঁর পরিবারের নারীদের কয়েকটি নড়বড়ে নৌকায় চড়িয়ে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে জাহাঙ্গীরনগরে গৃহবন্দী হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর মীরন জাহাঙ্গীরনগরের সে-সময়ের শাসনকর্তা যশরথ খানকে লিখিত নির্দেশ দেয় যে, তিনি যেন ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে হত্যা করেন। কিন্তু এই সদাশয় শাসনকর্তা মুর্শিদাবাদ রাজপরিবারের নিকট তাঁর উন্নতি ও অন্নের জন্য ঋণী ছিলেন। ফলে তিনি মীরনের ঘৃণ্য নির্দেশ পালন করতে অসম্মতি জানান। পরে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে শিরাজের মা আমিনা বেগম ও খালা ঘসেটি বেগম দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর তাঁদের বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। (যাকারিয়া, ২০০৬, পৃ. ৩৬৯)

তবে ইতিহাসবিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর পলাশির ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*তে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মীরনের হুকুমে নবাব পরিবারের নারীদের বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করার প্রসঙ্গটি নিতান্তই ইংরেজ-মদদপুষ্ট লেখকের কল্পনাপ্রসূত। তিনি বলেন– খুশবাগ কবরস্থানে যেহেতু ঘসেটি বেগম ও

আমিনা বেগমের সমাধি রয়েছে, সেহেতু বলা যায়, বুড়িগঙ্গায় মৃত্যু হলে লাশ পাবার কথা নয়, কিংবা সেসময়ের প্রেক্ষাপটে পানিতে ডোবা মরদেহ ঢাকা থেকে তুলে এনে দীর্ঘযাত্রার পর মুর্শিদাবাদে দাফন সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। বরং মীরজাফরের পুত্র মীরনের বজ্রপাতে মৃত্যুর খবর নিয়তির বিধান হিসেবে লোকপ্রিয় করে তুলতে তার প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি এই কল্পগল্প সাজিয়েছেন যে, নবাব পরিবারের মৃত্যুপথযাত্রী নারীদের অভিশাপেই মীরনের বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে; ইংরেজদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ড নয়। (যাকারিয়া, ২০০৬, পৃ. ৩৭০-৭১)

আবার, সাংবাদিক-গবেষক রেহান ফজল বিবিসি নিউজের এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে (ফজল, ২০২০) নবাবমহলের নারীদের পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক করম আলির *মুজফফরনামা* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– প্রায় ৭০ জন নিরপরাধ বেগমকে একটি নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়, আর সেখানেই নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়া হয়। শিরাজদ্দৌলার বংশের বাকি নারীদের বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়। নৌকাডুবি আর বিষখাইয়ে যাদের হত্যা করা হয়, তাদের সবাইকে একই সঙ্গে নদীর ধারেই খুশবাগ নামের একটি বাগানে দাফন করা হয়। শুধু একজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। তিনি হলেন শিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নিসা। মীরজাফর আর তার ছেলে মীরন– দুজনেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লুৎফুন্নিসা পিতা-পুত্র দুজনের প্রস্তাবই এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রথমে হাতির পিঠে চড়েছি, এখন গাধার পিঠে চাপা সম্ভব নয়।[২] সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য কাব্যনাটকে লুৎফুন্নিসার প্রতি মীরনের আকর্ষণের এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন আমিনা বেগমের সংলাপের মাধ্যমে :

কেন মীরন!
তার পিতা সিরাজের সিংহাসন পাবে।
পুত্র নেবে সিরাজের বিধবাকে –
চোখ তার বহুদিন থেকে! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮৬)

মীরজাফর ও মীরনের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে কিংবদন্তিতুল্য সংলাপ উচ্চারণ করেছিলেন লুৎফুন্নিসা, তা নাট্যকার আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন। ঘসেটি যখন তাদের মুক্তির উপায় হিসেবে লুৎফাকে নতুন রাজকুমার মীরনের প্রস্তাবে রাজি হবার জন্য আকুল আকুতি জানিয়েছে, তখন লুৎফা অত্যন্ত ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে :

আমি রাজহস্তীর রমণী। হস্তীতে অভ্যাস যার
গর্ধভের কাছে যাওয়া অসম্ভব তার। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪৩০)

তবে নবাব পরিবারের এই ট্রাজিক পরিণতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে; যা বিশ্লেষণের জন্য মুর্শিদাবাদ রাজদরবার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে মুঘল রাজত্বের ব্যাপ্তি ও স্থিতি বিবেচনায় যদি স্বাধীন বাংলা ভূখন্ডের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে সেখানে দেখা যাবে বাংলা অঞ্চল ছিল মুঘলদের সুবা বা প্রদেশ। বাংলায় নিয়োজিত সুবাদার বা নবাবরা দিল্লির মুঘল সালতনাতকে নিয়মিত খাজনা দিয়ে এ অঞ্চল শাসনের সুযোগ পেত। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) যেমন পাঠিয়েছেন সেনাপতি

মানসিংহকে (১৫৫০-১৬১৪), সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭) পাঠিয়েছিলেন ইসলাম খানকে (১৫৭০-১৬১৩), তেমনি সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭) এ অঞ্চলের সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পৌত্র আজিম উস শানকে (১৬৬৪-১৭১২); যাঁর দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ (১৬৬৫-১৭২৭)। এই মুর্শিদকুলি খাঁর হাতেই পত্তন ঘটে নবাব বংশের; এবং তাঁর হাতেই রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা পায় মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন এ অঞ্চলে আসেন, তখন বর্তমান ঢাকা বা তৎকালীন জাহাঙ্গীরনগর ছিল বাংলার রাজধানী। এসময়ে ইংরেজসহ অন্য বেনিয়ারা ব্যবসার জন্য হুগলি বন্দর ব্যবহার করতো; তাদের ব্যবসার পসার ছিল ভাগীরথী ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে। ফলে মুর্শিদকুলি নিজস্ব দপ্তর ঢাকা থেকে তৎকালীন মনসুরাবাদে স্থানান্তর করেন; এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিজস্ব কর্মদক্ষতা দ্বারা বিপুল রাজস্ব পাঠান। সম্রাট তাঁর বাংলার ভূমিব্যবস্থাপনা ও কর কাঠামো সংস্কারের দক্ষতা দেখে, তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে বাংলার শাসনব্যবস্থার প্রধান বা নাজিম করে পাঠান। অর্থাৎ প্রশাসন ও রাজস্ব দুটোই তখন মুর্শিদকুলির হস্তগত হয়। তিনি তখন সর্বক্ষমতার অধিকারী হয়ে নবাব পদ অলঙ্করণ করেন এবং তাঁর নিজের নাম অনুসারে রাজধানীর নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ একজন উত্তম শাসক ছিলেন। তিনি বাংলার অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজান। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তিনি ছিলেন অপুত্রক। ফলে তিনি তাঁর প্রিয় পৌত্র সরফরাজ খাঁকে (১৭০০-১৭৪০) বাংলার মসনদের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। কিন্তু সরফরাজের পিতা উড়িষ্যার সুবেদার সুজা উদ্দিন মুহম্মদ খান (১৬৭০-১৭৩৯) পুত্রকে সরিয়ে বাংলার স্বঘোষিত নবাব হন। সরফরাজ তখন স্থানীয় শেঠ ও পদস্থদের পরামর্শে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে না গিয়ে তার শাসন মেনে নেন। উল্লেখ্য যে, সুজাউদ্দৌলার প্রাক্তন প্রশাসনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত আলিবর্দি খাঁ (১৬৭১-১৭৫৬) ও তাঁর বড় ভাই হাজী আহমেদ। সুজাউদ্দৌলার নবাবি পদপ্রাপ্তির সাথে সাথে তাঁরাও তখন রাজধানীতে এসে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর এবার যখন তাঁর ছেলে সরফরাজ সিংহাসনে বসেন, তখন বিহারের সুবাদার পদে কর্মরত আলিবর্দি খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধের (১৭৪০) মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে মুর্শিদাবাদ ও সিংহাসন দখল করেন। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের সংস্কৃতি তখন থেকেই শুরু হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) তাঁর *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* (১৭৫২) গ্রন্থসূচনায় এ বাস্তবিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন নিম্নরূপে :

> সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
> দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়াঁ।
> ছিল আলীবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
> আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥
> তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
> মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব। (রায়গুণাকর, ২০০৫, গ্রন্থসূচনা)

আলিবর্দি খাঁ রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ও কূটকৌশলের মাধ্যমে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর অধীন কর্মচারী মীরজাফর আলী খাঁ (১৬৯১-১৭৬৫) ছিলেন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ফলে পরবর্তীকালে নবাব শিরাজদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মসনদচ্যুত করতে তার বিবেকে এতটুকু বাধেনি। এ যেন আলিবর্দি কর্তৃক নিরপরাধ নবাব সরফরাজ হত্যার বিপরীতে প্রকৃতির প্রতিশোধ। ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মীরজাফরের উপর আলিবর্দির অবৈধভাবে সিংহাসন দখলের ঘটনার প্রভাব নিয়ে লেখেন:

> আলিবর্দ্দীর এই অসাধু ব্যবহারে মীরজাফর যাহা শিক্ষালাভ করিলেন, তাহা আর ইহজীবনে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, সিংহাসন লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রভুহত্যা করা নিন্দনীয় নহে! ষড়যন্ত্র ও বাহুবলে একবার আত্মকার্য্য সাধন করিতে পারিলেই হইল, তাহার পর সে কথা লইয়া লোকে উচ্চবাচ্য করিবার অবসর পায় না। (মৈত্রেয়, ২০১৭, পৃ. ১৫)

তবে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও নবাব আলিবর্দি খাঁ একজন দক্ষ ও মানবিক প্রশাসক ছিলেন। ফলে তাঁর আমলে বাংলার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু তিনিও নিষ্কণ্টক উপায়ে শাসন পরিচালনা করতে পারেননি। বার বার তাঁকে মারাঠা দস্যু বা বর্গিদের প্রতিহত করতে হয়েছে; আফগান সেনাদের বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে। তিনি কখনো সন্ধির মাধ্যমে, কখনো যুদ্ধজয় করে এসকল বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমন করেন। ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরী এ বিষয়ে তাঁর *পলাশীর অজানা কাহিনী* গ্রন্থে লিখেছেন :

> আলিবর্দীর রাজত্বের প্রথম দিকে প্রায় দশ বছর ধরে (১৭৪২-৫১) মারাঠারা প্রায় প্রত্যেক বছর বাংলা আক্রমণ ও লুঠ করতে অভিযান চালিয়েছে। তা ছাড়া এ সময় আফগান বিদ্রোহও হয়। আফগানদের দমন করে ও মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি (১৭৫১) করার পর আলিবর্দী দেশের ও প্রজাদের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হন ও সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেন। (চৌধুরী, ২০১৯, পৃ. ১৬)

সৈয়দ শামসুল হক এই ঐতিহাসিক সত্য *নারীগণ* নাটকে উপস্থাপন করেছেন শরিফা ও আমিনা চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপে। আলিবর্দির স্ত্রী শরিফা বেগম এ রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে মহলের নারীদের দুঃখ সামলে ওঠার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেছে :

> বর্গির হামলার কথা মনে নেই ?
> মহারাষ্ট্র থেকে বালাজি রগুজি আর
> ভাস্কর পন্ডিত বর্গিদস্যুদল নিয়ে
> উড়িষ্যার গিরিনদ বীরভূম বিষ্ণুপুর অতিক্রম করে
> কীভাবে বাংলার বুকে নেমে আসে ঘোড়ায় সোয়ার !
> [...] দীর্ঘ এ জীবনে
> অনেক অনেক যুদ্ধ দেখে দেখে বার্ধক্যে পৌঁছেছি,
> বর্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

পাটনায় আফগান বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ, [...]
পরাজয় কখনো মানিনি। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮৪)

অন্যদিকে, মুর্শিদকুলির মতো আলিবর্দি খানও অপুত্রক ছিলেন। তিনি নিজের তিন কন্যাকে বড়ভাই হাজি আহমেদের তিন ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁর বড়কন্যা ঘসেটি বেগম বা মেহেরুন্নেসাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মতিঝিল প্রাসাদে পাঠান; আর কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন শিরাজের মাতা আমিনাকে। কিন্তু পাটনার সুবেদার থাকাকালে আলিবর্দির ভাই হাজি আহমেদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনুদ্দিন আহমদ অর্থাৎ আমিনার শ্বশুর এবং স্বামী আফগান বিদ্রোহীদের হামলায় অকালে মারা যান। তখন সপুত্রক আমিনা পুরোপুরিই আলিবর্দির আশ্রিতা হয়ে পড়েন। আমিনা চরিত্রটির সংলাপে এ ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। আমিনা তার হতভাগ্য অতীত ইতিহাস স্মরণ করে পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনার সুরে বলেছেন :

পাথরে তো নয়, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া,
রূপ যার আকাশের আদম সুরত –
আমি সেই স্বামী, তোর শ্বশুরকে হারিয়েছি
পাটনায় এক রাষ্ট্রবিদ্রোহের কালে।
আফগান ঘাতকের হাতে তার শিরোচ্ছেদ হয়। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৮)

আবার শরিফা চরিত্রটিও আমিনার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এ ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

আমার ভাশুর, হাজী আহমদ খান তোর শ্বশুর, আমিনা,
তারও মৃত্যু হয়েছিলো ঘাতকের হাতে
সেই একই পাটনা বিদ্রোহে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৮)

শিরাজের বড়ো খালা ঘসেটি বেগম নিজেও ছিলেন সন্তানহীন। শিরাজের মধ্যম ভ্রাতা ইকরামুদ্দৌলাকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। অন্যদিকে আমিনার জ্যেষ্ঠপুত্র শিরাজের জন্মের পরপরই আলিবর্দির ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তাই অপুত্রক আলিবর্দি খুশির আতিশয্যে নাতিকে দত্তক নেন এবং পুত্রবৎ আদর ও প্রশ্রয় দিয়ে বড় করেন। করম আলী রচিত ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ *মুজাফফরনামার* সূত্র দিয়ে ঐতিহাসিক সুশীল রায় এ বিষয়ে লিখেছেন :

> আলিবর্দী সিরাজের জন্ম থেকেই তাঁর প্রতি এমন স্নেহান্ধ ছিলেন যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে কাছছাড়া করতেন না। তিনি তাঁকে রাষ্ট্রনীতি, শাসনকার্য ও শাসক-অভিজাত জীবনের নানা গুণাবলি শেখাতেন। সিরাজের প্রতি তাঁর স্নেহ এমনই অন্ধ ছিল যে সিরাজের সমস্ত অপকীর্তিকে তিনি যেন দেখেননি বা শোনেননি এমন ভাব করতেন। [...] সিরাজের চিন্তা ছাড়া তাঁর একটি মুহূর্তও কাটত না। (চৌধুরী, ২০১৯, পৃ. ২০)

মাতামহ আলিবর্দি খাঁর অতিরিক্ত প্রশ্রয় ও সমর্থনে কিশোর শিরাজ প্রথম জীবনে কিছুটা উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এসময়ে মন্দস্বভাবের নানান বন্ধু-বান্ধব জুটে যায় তার। এ-অবস্থায়ও আলিবর্দি তাকে ভাবী নবাব কল্পনা করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে

অভিষিক্ত করেন। এমনকি আলিবর্দি নিজের সঙ্গে শিরাজকে বিভিন্ন যুদ্ধযাত্রায় নিয়ে যান ভাবী নবাব হিসেবে যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। কিশোর-বয়সেই তিনি শিরাজকে ঢাকার নৌবাহিনীর প্রধান করেছেন, আবার রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের সুবাদার করেও পাঠিয়েছেন। একদিকে কিশোর শিরাজের স্বেচ্ছাচারী আচরণ এবং অন্যদিকে তার প্রতি নানা আলিবর্দির অকুণ্ঠ সমর্থনে আত্মীয়-স্বজন যারপরনাই অসন্তুষ্ট ছিলেন; যা আরও প্রকট হয়ে পড়ে আলিবর্দি কর্তৃক শিরাজকে নবাবরূপে মনোনীত করার পর। আবার, ঘসেটি বেগম চেয়েছিলেন তাঁর পালকপুত্রকে নবাব পদে অভিষিক্ত করতে। অন্যদিকে, সিরাজের মেজো খালা মোমেনা বেগমের ছেলে পুর্ণিয়ার নবাব শওকত জং-ও চেয়েছেন নবাব হতে। আলিবর্দি বেঁচে থাকতেই ভেতরে ভেতরে ক্ষমতা দখলের এই উচ্চাভিলাষ ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। ঘসেটির জীবনে এসময়ে দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। একদিকে তাঁর পালকপুত্র ইকরামুদ্দৌলা বসন্তরোগে মারা যায়, অন্যদিকে স্বামী নওয়াজিশ মুহম্মদ খানকে অকালে হারিয়ে তিনি বৈধব্য বরণ করেন। ঘসেটির ইচ্ছে ছিল পালকপুত্রকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাজমাতা হবেন। কিন্তু ছেলের অকাল মৃত্যুতে সে আশা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তাঁর স্বামীর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন হোসেনকুলি খাঁ ও বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ। জনশ্রুতি আছে যে, ঘসেটি বেগমের সঙ্গে এদের নীতিবিরুদ্ধ ঘনিষ্ঠতা ছিল,[৩] বিশেষ করে হোসেনকুলি খাঁর বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বে ঘসেটি বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। একথা অবগত হয়ে রাজমহলের সম্মান রক্ষার্থে, নানা আলিবর্দির আদেশে হোসেনকুলি খাঁ-কে শিরাজ প্রকাশ্য দিবালোকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। আলোচ্য কাব্যনাটকে নাট্যকার এ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন শিরাজের মাতা আমিনার একটি সংলাপের মাধ্যমে :

> ঘসেটির বিবরণ আরো মনে করাবো কি ?
> স্বামী বেঁচে থাকতেই উপপতি!
> খুন হয় হোসেনকুলী যে, কেন হয় ?
> তার সঙ্গে ঘসেটির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে –
> এমন কি স্বামী বেঁচে থাকতেই!
> আলিবর্দী বংশের মর্যাদা নষ্ট, লোকনিন্দা, বাজারে গুজব
> শুনে শুনে দেখে দেখে বিচলিত হয়েছে শিরাজ।
> খালাকে সে শাসন করেছে। [...]
> ঘসেটির বসবাস মতিঝিল থেকে তুলে আনে এই হীরাঝিলে। [...]
> হোসেনকুলীকে করে খঞ্জরে খতম। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৭)

এই ঘটনার পর ঘসেটি শিরাজের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। তিনি উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে শওকত জঙ্গকে সমর্থন করতে থাকেন। আবার অন্য একটি সূত্র বলছে– শওকত জঙ্গকে নয়, বরং নিজ পোষ্যপুত্রের রেখে যাওয়া শিশু-সন্তান মুরাদুদ্দৌলাকে নিয়ে তিনি ক্ষমতাহরণের স্বপ্ন দেখেন। (আলীম, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮০)। সৈয়দ হক অবশ্য দ্বিতীয়সূত্রটি অনুসরণ করে শরিফা চরিত্রের সংলাপে নিম্নোক্ত তথ্য জ্ঞাপন করেছেন :

> ভুলি নি ঘসেটি তার পোষ্যপুত্রটিকে একদিন
> চেয়েছিলো নবাব বানাতে।

অকালে প্রয়াত হলে স্বামী কোনো সন্তান না রেখেই–
[...] হঠাৎ অকালে মৃত্যু হলে পোষ্যপুত্রটির, তারই শিশুটিকে
কেন কাছে টেনে নেয় আবার ঘসেটি ?
শিরাজের বিরুদ্ধে সে বদ প্রচারণা করে–
শিরাজ মদ্যপ, বেয়াদব, ক্ষমতার সীমাহীন দর্প তার,
নারী লোলুপ শিরাজ। কেন বলে ?
অযোগ্য শাসকরূপে শিরাজকে প্রমাণ করতে।
আশা ছিলো শিরাজের পতন ঘটবে,
নাবালক পোষ্যনাতী পাবে সিংহাসন –
পর্দার আড়ালে থেকে নবাবিটা ঘসেটি করবে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৬)

পলাশির ট্রাজিক ঘটনার অন্যতম খলনায়ক মীরজাফর আলি খান ছিলেন আরববংশীয় দাস। এদেশে এসে আলিবর্দির শাসনামলে তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি ঘটে। কিন্তু আলিবর্দির আমলেও সে নানান প্রতারণামূলক কাজে অংশ নেয়, যার ফলে সেসময়ে তাকে একাধিকবার পদচ্যুতও হতে হয়। কিন্তু নানা উপায়ে সে আবার আলিবর্দির মন ভুলিয়ে ক্ষমতায় টিকে যায়। শিরাজ ক্ষমতায় বসার পর তার উপর রুষ্ঠ হয়ে তাকে একবার পদচ্যুতও করেন ; কিন্তু সম্ভাব্য সেনাবিদ্রোহের আশঙ্কা করে তরুণ নবাব তাকে পুনরায় নিজ পদ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। আবার, নবাবসুলভ অহম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বন্ধুপ্রতিম ফরাসি কুঠিয়ালদের সহায়তা নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের উদ্ধত আচরণ দমন করতে ব্যর্থ হন শিরাজ।

তবে শিরাজদ্দৌলা এসময়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের চালচিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হলেও, কিছুটা আন্দাজ করে নিতে পারেন যে, ইংরেজ বেনিয়াদের পাশাপাশি তাঁর অমাত্য ও ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে যে-কোনো মুহূর্তে প্রতারণা করতে পারেন। ফলে পলাশির চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে তিনি এদের রাজদরবারে ডেকে এনে যার যার ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করিয়ে নেন। এসময় প্রধান সেনাপতি মীরজাফর পবিত্র কুরআন শরিফ ছুঁয়ে শপথ করেন যে, তিনি শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করে হলেও নবাবের সাথে থাকবেন। অন্যরাও যার যার ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই উপযুক্ত সময়ে তাদের শপথ ভঙ্গ করে তরুণ নবাবের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা উল্লেখ করেছেন কুতুবের নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে :

মীরজাফর আলী খান সিপাহ্-সালার আজম
যুদ্ধ নয়– যুদ্ধ পরিচালনার অভিনয় করে, একদিকে
গত রমজান মাসে, তাও শবে কদরের রাতে,
শিরাজের কাছে তার কোরান শপথ, জানবাজি লড়বে সে,
অন্যদিকে ক্লাইভের সঙ্গে তার গুপ্তচুক্তি– নিষ্ক্রিয় থাকার।
এভাবে নিশ্চিত করা শিরাজের পরাজয়। চুক্তি আসলে,
মীরজাফরকে দেয়া হবে শিরাজের শূন্য সিংহাসন। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৭৪)

উল্লেখ্য যে, ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধে নবাব শিরাজের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো। অন্যদিকে, ইংরেজ সেনাছাউনিতে মাত্র দুই-তিন হাজার সৈন্য ছিলো। অস্ত্র, কামান গোলাবারুদ সবদিক দিয়েই শিরাজবাহিনী ছিল এগিয়ে। তবু তিনি পরাজিত হয়েছেন দুটি কারণে : প্রথমত, তাঁর সেনাপ্রধান মীরজাফর ও অপর সেনানায়ক রায়দুর্লভসহ অন্যদের আয়ত্তে থাকা প্রায় ৪৫০০০ সৈন্য সেদিন কার্যত কোনো যুদ্ধ করেনি। তারা পালন করেছিল নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা। অপরদিকে মোহনলাল, মীরমর্দান ও শিরাজের বন্ধুপ্রতিম ফরাসি সেনানায়কের অধীনে থাকা প্রায় ৫০০০ সেনা বীর-বিক্রমে লড়াই করে ইংরেজদের প্রায় পরাজিত করে ফেলেছিল। কিন্তু এসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি হলে শিরাজের গোলাবারুদ ভিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবুও শিরাজের অনুগত সৈন্যরা হাতে হাতে লড়াই করে প্রবল পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজদের উপর। এমতাবস্থায় ইংরেজদের গোলার আঘাতে মীরমর্দান ও ফরাসি সেনানায়কের মৃত্যু হলে শিরাজবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শিরাজ এসময়ে নিরুপায় হয়ে মীরজাফরের কাছে সাহায্যের জন্য করুণ আকুতি জানান। কিন্তু নবাবির স্বপ্নে বিভোর মীরজাফর তখনও তার বিশ্বাসঘাতকতা বজায় রেখে তাকে উল্টো পরামর্শ দেন– সেদিনকার মতো যুদ্ধ বন্ধ রাখতে। মোহনলাল এতে রাজি না হলেও নবাবের ক্রমাগত অনুরোধে যেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে থাকেন– তখনই ইংরেজ সৈন্যরা উপর্যুপরি আক্রমণে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। অনন্যোপায় শিরাজ পরাজয় বরণ করেন; জয়ী হন ক্লাইভ-মীরজাফরের যৌথ বাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এককভাবে এ উপমহাদেশ শাসনের প্রথম ধাপ। ক্ষমতাগ্রহণ করলেও একদিকে স্থানীয় জনবিদ্রোহের আশঙ্কা, অন্যদিকে দিল্লির মুঘলদের অনুমতির প্রয়োজনে তারা ‘ধীরে চলো’ নীতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যে কারণে ২৪ জুন ১৭৫৭ সালে লেখা এক চিঠিতে সে মীরজাফরকে নবাব সম্বোধন করে অভিনন্দিত করে লিখেছে :

> I congratulate on the victory which is yours, not mine. I should be glad if you would join me with the utmost expendition. We propose marching tomorrow to complete the conquest [...]. I hope to have the honour of proclaiming you Nobab. (চৌধুরী, ২০১৯. পৃ. ১৫৮)

মীরজাফরের পর যাঁরা নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানির হাতের পুতুলমাত্র। বেশ কয়েকবছর তাঁরা কেবলই সিংহাসনে আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। কেউই ঋজু ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। যে কারণে সৈয়দ শামসুল হক এ-অবস্থাকে আলোচ্য নাটকে ‘বারাঙ্গনার সিংহাসন’ বলে মন্তব্য করেছেন।

নবাব শিরাজদ্দৌলা পরাজয় নিশ্চিত জেনে এসময়ে নিজ ছাউনি থেকে কোনোমতে পালিয়ে রাজধানী রক্ষার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। উটের পিঠে চেপে এক রাতের মধ্যেই তিনি ৫০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে এসে তিনি তেমন কারো সহযোগিতাই পাননি। সাধারণ জনগণ বরং শিরাজের পতনের খবর শুনে

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিজয়ী লুটেরাদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচতে দলে দলে রাজধানী ত্যাগ করতে থাকে। শিরাজের শ্বশুর ইরেজ খানও এসময়ে পালিয়ে যান। এ-নাটকে ঐতিহাসিক এ ঘটনার বর্ণনা নাট্যকার উল্লেখ করেছেন এভাবে :

বিনা যুদ্ধে পরাজিত বাংলার নবাব।
নবাব শিরাজদ্দৌলা পলাশীর মাঠ ত্যাগ করে
রাজহস্তির সোয়ার হন, পরদিন শুক্রবার
দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে
তিনি রাজধানীতে ফেরেন। [...]
তাঁর সময় যে কম! পুনরায় যুদ্ধ চাই নতুন উদ্যমে।
অবিলম্বে রাজকোষ খুলে দেন তিনি।
জুম্মার মিছিলে তিনি পথে পথে ঘোষণা করান–
তরুণ জোয়ান এসো, অগ্রিম মাহিনা নাও, যুদ্ধ সাজ পরো। [...]
কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না,
দাঁড়ালো না শিরাজের পাশে।
[...] বিপন্ন সময়ে কেউ আত্ম ছাড়া চেনে না অপর! –
শ্বশুর ইরিচ খান মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে সরে পড়লেন–
তবে সরে পড়বার আগে
রাজকোষ তিনিও দু'হাতে লুট করলেন যতটা পারেন।
নগরে যে বাজে লোকজন আর সিপাহীরা ছিলো
তারাও দুহাতে নিলো সিক্কা টাকা সোনার মোহর।
কিন্তু যুদ্ধসাজে তারা সজ্জিত হলো না। [...]
রাজকোষ নিঃশেষিত রাত্রির আগেই। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৭৫)

শিরাজ নতুন করে লড়াইয়ের জন্য তখন ফরাসি কুঠির প্রধান জাঁ ল-এর সাহায্য প্রার্থনায় পাটনায় যাবার জন্য স্ত্রী-সন্তানসহ গোপনে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু লোকশ্রুত আছে যে, দান শাহ[৪] নামক এক ফকির বিশ্বাসঘাতকতা করে শিরাজের অবস্থানের কথা রাজধানীতে বিরুদ্ধপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে শিরাজ পত্নীকন্যাসমেত অচিরেই মীরকাসিমের হাতে ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নীত হন। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে এসব ঘটনার প্রায় অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। তবে এ অংশে তাঁর পূববর্তী নাট্যকারগণের অনুসরণে তিনিও ইতিহাসের সামান্যসূত্রকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে আবেগাত্মক ভঙ্গিতে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন :

বজরায় নয়, পানসীতে নয়,
বাংলার নবাব আজ হাটুরের সামান্য নৌকায়। [...]
পাঁচদিন একটানা চলবার পর
কালিন্দীর তীরে নবাব শিরাজদ্দৌলা
কাহপুর গ্রামে থামলেন ক্ষুধার আহার্য খোঁজে।
পিপাসায় মৃতপ্রায় পত্নী লুৎফা, দুধ বিনা কোলের কন্যাটি।
তীরে এক ফকিরের আস্তানায় খাদ্যভিক্ষা করলেন তিনি। [...]

দানশা ফকির! পশ্চাৎ ধাবনকারী মীরকাশেমের কাছে
নবাবের সংবাদ পাঠায়। [...]
শিরাজেরই অনুগ্রহে জায়গীরভোগী যে কাশেম,
শিরাজকে সে-ই বন্দী করে,
সাধারণ কয়েদীর বেশে তাঁকে পাঠায় মুর্শিদাবাদে।
এরই নাম কৃতজ্ঞতা বটে ! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৭৭)

বলাবাহুল্য, এসময়ে ইংরেজদের পরামর্শে মীরজাফর জনগণের মধ্যে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনের নিমিত্তে রাজনিয়মে পশমি রুমালে শিরাজকে না বেঁধে লৌহশৃঙ্খলে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে আনে। এরপর মীরজাফরের পুত্র ১৭ বছর বয়সী মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগের হাতে বাংলার নবাব নির্মমভাবে শহিদ হন। পলাশি গ্রামের এক নিরক্ষর কবির কবিতায়ও এ নির্মম ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নরূপে :

নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি ॥
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ। (ভট্টাচার্য, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৬)

নাটকের শেষে কুতুব চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঘটনাংশ নাট্যকার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে রচনা করেছেন। বস্তুত, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে শিরাজ এবং মুর্শিদাবাদের ট্রাজিক ঘটনা বাঙালির আবেগ-বেদনার সঙ্গে মিশে আছে। ফলে সৈয়দ শামসুল হক নাটকে সেই আবেগটিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন নাট্যরস ও নাট্যাবেগ সৃষ্টির প্রয়োজনে। তবে তিনি ইতিহাসের বাস্তবতাকে কখনো অস্বীকার করে যাননি। এ ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংঘটিত ধানমন্ডির ট্রাজিক ঘটনার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু এবং রক্তাক্ত ও শোকাবহ পঁচাত্তর যে নাট্যকারের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত এটি তার প্রমাণ। যেমন :

এখনি দেখতে পাই আরো দুটি শতাব্দীর পরে
আরো এক হত্যা হবে এই বাঙ্গালায়।
সেদিনও রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকবে
সেদিনও রাস্তায় লোক নিশ্চেষ্ট নিশ্চল।
সেদিনও অনেকে যাবে ঘাতকের কাছে–
রোষে নয়, প্রতিরোধ প্রতিশোধে নয়–
ক্ষমতার অংশ নিতে রাষ্ট্রক্ষমতার।
হত্যা তো কেবল হত্যা করলেই নয়–
আলিঙ্গন করা হত্যাকারীকে তো এক অর্থে হত্যাই নিশ্চয়। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪৩১)

এখানে সহজেই অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে যে ন্যাক্কারজনক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিল, নাট্যকার সেই ঘটনাকে বিগত ইতিহাসের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন; এবং একজন দেশপ্রেমিক নেতার মৃত্যুতে প্রতিবাদ-

প্রতিরোধের পরিবর্তে জনগণের একই নির্লিপ্ত অবস্থানকে নিন্দা করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছেন সমাজের সেই শ্রেণিকে– যারা ক্ষমতালোভে মত্ত হয়ে ন্যায় অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে ঘাতকের সঙ্গে হাত মেলায়। তাঁর মতে, হত্যাকারীকে মদদ দেওয়াও একধরনের হত্যাকান্ড। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, পনেরো আগস্টের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা বসেছে তারা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের বদলে তাঁর ঘাতকদের পুরস্কৃত করেছে নানান সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু তনয়ারা থেকে গেছে দেশের বাইরে চরম অবহেলা আর আশঙ্কাময় অবস্থায়। এমনকি শাসকগোষ্ঠী সংবিধান বদলে আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দীর্ঘকাল বন্ধ করে রেখেছে। সৈয়দ শামসুল হক সে প্রসঙ্গটিই এখানে উত্থাপন করেছেন।

কেবল শিরাজকেই নয়, পরবর্তীকালে অত্যাচারী মীরন একে একে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে। মহলের নারীরা দীর্ঘদিন বন্দী থাকে ঢাকার কেরানীগঞ্জস্থ জিঞ্জিরা প্রাসাদে। এরপর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভের সহায়তায় লুৎফুন্নিসা তাঁর কন্যাসহ মুর্শিদাবাদ ফিরে যান; এবং কোম্পানি-প্রদত্ত সামান্য মাসোহারায় করুণ জীবনযাপন করে ১৭৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অবশ্য শিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় বসেছে প্রকৃতির বিচারে তারা কেউই শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে কিছুকাল রাজত্ব করলেও অনতিকাল পরেই ইংরেজদের রোষে পড়ে সিংহাসনচ্যুত হন। পরে আবার অল্পসময়ের জন্য সিংহাসন ফিরে পেলেও কুষ্ঠরোগে ভুগে নির্মম মৃত্যু হয় তার। তার পুত্র মীরন বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করে। তবে জনশ্রুতি আছে যে, ইংরেজরাই তার নির্মমতায় বিস্মিত হয়ে আততায়ীর মাধ্যমে তাকে গোপনে হত্যা করেছে। অন্যদিকে, মীর কাসিম কিছুকাল রাজত্ব পেলেও ইংরেজদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় ইংরেজদের সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। দিল্লির রাজপথে আমৃত্যু ভিখিরিজীবন যাপনের পর রাজপথেই চরম অবহেলায় তার মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় জগৎশেঠ পরিবার ছিল শিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার নেপথ্য শক্তি। মীরকাসিমের হাতে এই শেঠ পরিবারের বড় শেঠ ভাই মহতাব ও স্বরূপচাঁদের সলিল সমাধি ঘটে। উমিচাঁদ ইংরেজদের প্রতারণায় পলাশির ষড়যন্ত্রদলিলের শর্তানুযায়ী স্বত্বভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এমনকি যে ক্লাইভ ছিল ষড়যন্ত্রের মূল ক্রীড়নক; সেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অপমানিত, লজ্জিত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি নিজের গলায় নিজে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। এভাবেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে এবং অনাগত মানুষের জন্য রেখে গেছে দৃষ্টান্ত। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে একই ভুল বারবার করে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে আততায়ীর হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

শিরাজের পতনের এ ইতিহাস নিয়ে সমকালে অনেকেই গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের রচনার পেছনে একধরনের উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ কিংবা ফরাসি যে লেখকই

এ-বিষয়ে ইতিহাস লিখেছেন, প্রত্যেকেই শিরাজের চরিত্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছেন। ফলে শিরাজ এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময় জনগণের কাছে খলচরিত্র হিসেবেই থেকে গেছেন। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতিহাসবেত্তা ও গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্র শিরাজের জীবনকাহিনি অবলম্বনে নতুন করে গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে শিরাজ সম্পর্কে এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্যসমূহের অসারতা প্রমাণিত হয়। এরপর সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচনা করেন অসামান্য শিল্পসফল নাটক *সিরাজুদ্দৌলা* (১৯৩৮)। অতঃপর পলাশির ঘটনা ও শিরাজ প্রসঙ্গ নতুন মাত্রা পায়। মানুষের মুখে মুখে রচিত হতে শুরু করে তার বন্দনাগীত। *নারীগণ* কাব্যনাটকে কুতুব চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপে মাধ্যমে শিরাজ চরিত্রের মহিমান্বিত স্বরূপ শিল্পরূপময় হয়ে উঠেছে :

> ক্রমে চিড় ধরে যাবে শিরাজের হীরাঝিলে,
> ঘসেটির মতিঝিলে, আর মীরজাফরের হাভেলিতে।
> একদিন বিরান সুনসান হয়ে যাবে সব,
> ইট খসে পড়ে যাবে, সৌধচূড়া মাটিতে গড়াবে,
> দেউড়িতে বাসা নেবে শৃগাল বাদুড়।
> পলাশীরও লাক্ষাবাগ আম্রবন পড়ে যাবে ভাগীরথী বুকে।
> কিন্তু শিরাজের নাম ক্রমে বৃদ্ধি পাবে।
> বাঙ্গালার বিদ্রোহে বিপ্লবে
> শিরাজ আবার এসে সমুখে দাঁড়াবে।
> তার ভুল ভ্রান্তি ভাগ্য যাই হোক,
> তার নাম উজ্জ্বলতা পাবে।
> তিনি হয়ে উঠবেন মানুষের কাছে এক প্রতীকী মানুষ। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪৩৩)

শিরাজের মৃত্যুর পর যারাই নবাবি পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরেজদের বশংবদ; পুতুল রাজা। নেপথ্য থেকে তাদের পরিচালিত করেছে ইংরেজ। একপর্যায়ে মীরজাফর, মীরকাসিমের সঙ্গে রাজ্য ও রাজত্বের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ইংরেজদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। অবশেষে মীরজাফরের মৃত্যু ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মীরকাসিমের পলায়নের পর ইংরেজরা সরাসরি তৎকালীন দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহকে নজরানা দিয়ে বাংলার পুরো রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেরাই নিয়ে নেয়। আর তখনই আক্ষরিক অর্থে বাংলায় শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। তারা এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাচারী নায়েব নিয়োগ করে সাধারণ জনগণকে শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করতে থাকে। রংপুর অঞ্চলের দেবী সিংহ তাদেরই প্রেরিত এমন একজন অত্যাচারী দেওয়ান। সৈয়দ শামসুল হকের অন্য ইতিহাসভিত্তিক কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবনে* যার অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। কোম্পানি আর তার সহযোগীদের প্রজাপীড়ন ও নির্বিচার শোষণে বাংলায় অচিরেই শুরু হয় মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬); যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে অধিক পরিচিত।

তবে সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* নাটকটি রচনা করেছেন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন উদ্দেশ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা নয়, কিংবা নূরলদীনের মতো ইতিহাসের অনালোচিত বীরকে খুঁজে এনে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়; তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাসের জমিনে আধুনিক নারীবাদের প্রতিষ্ঠা। বলা যায়, বিংশ শতকের শেষের দিকে এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকে বিশ্বজুড়ে নব্যনারীবাদের যে জোয়ার চলেছে, একজন আধুনিকমনস্ক শিল্পী হিসেবে তাতে সমর্থন জানাতেই তিনি এ নাটক রচনা করেছেন। তিনি রাজদরবারে পুরুষের বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নয়, বরং রাজমহলের অনালোচিত নারীদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও সংক্ষোভের চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে আলোচ্য নাটক রচনা করেছেন।

নারীগণ নাটকে নারীবাদ প্রসঙ্গ

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে *নারীগণ* নাটক রচিত হলেও নাট্যকার এখানে নারীবাদী তত্ত্বে (Feminism Theory) অনুপ্রাণিত হয়ে রাজমহলের নারীদের অপ্রকাশিত ও অনুচ্চ আর্তির কথা বলতে চেয়েছেন। ফলত, এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সমান্তরালে প্রকটিত হয়েছে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। রাজমহলের নারীরা যেহেতু মুসলিম অভিজাত পরিবারভুক্ত ছিল, সেহেতু সর্বসাধারণের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। নবাবরা তাদের এমন ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতেন যেন তারা মানুষ নয়, কোনো রত্নভান্ডারের গুপ্ত রত্ন ; যা কেবল নবাবরাই ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারেন। রাজনীতি, রাজদরবার কিংবা সামাজিক আচার-প্রক্রিয়ায় প্রকাশ্যে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঠাটে-ঠমকে নবাবের মনোরঞ্জনই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদেরও যে প্রাণ আছে, উপভোগের তীব্র স্পৃহা আছে তা জানানোর কোনো উপায়ই তাদের ছিল না। কিন্তু এসব নারীদের মধ্যেও যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তারাও যে বাইরের আলো-হাওয়ায় বিচরণের অধিকার রাখে, এ-কথাই সৈয়দ শামসুল হক নিজকল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নাট্যকার কেবল মহলের হতভাগ্য নারীদের মর্মগাথাই উপস্থাপন করেননি, বরং পুরুষসৃষ্ট এই যুদ্ধে অন্তঃপুরিকারা কীভাবে মানবিক বোধে ও অনুভবে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অনুভবে সংমিলিত হয়েছেন তাও নাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন– দুঃসময়ে মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না। শোষকের চেহারা যেমন এক, তেমনি শোষিতের ছবিও হয়ে যায় এক। তাঁর ভাষায় :

> আমির ফকির যদি মৃত্যুপথে এক –
> কাল যদি মন্দ, তবে সেও হয় মৃত্যুরই সমান।
> বেগম ও বাঁদীগণ আজ এক কাতারে এখন। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৭৩)

পুরুষের চোখে নারী কেবল ভোগের সামগ্রী। নারীর মাতৃরূপ বিস্মৃত হয়ে তাদের অঙ্কশায়িনী করতেই বরং তাদের আনন্দ। নাটকের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

> নারীকে ওরা সন্তানের জন্মসূত্র নয়,
> মনে করে কামচক্র ওটি।
> যেন প্রাচ্য নারীদের স্তন ঘন নয় মাতৃদুধে–
> কামনার সুরাপূর্ণ কোমর সোরাহি। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮১)

আঠারো শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গদেশের নারীদের এই অবস্থা, বহির্বিশ্বের নারী সমাজ তখন থেকেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। পুরুষের তুলনায় নারীকে হেয় করে না দেখে বরং একজন মানুষ হিসেবে নারীকে তারা মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছে। আর বাঙালি নারীদের সেই আওয়াজ তুলতে সময় লেগেছে বিংশ শতাব্দীতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) ভূমিকার আগ পর্যন্ত। বস্তুত, পাশ্চাত্য সমাজে মেরি ওলস্টোনক্রাফট্ হলেন প্রথম নারী, যিনি সমাজে নারীর বৈষম্যচিত্র এবং তার বিপরীতে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে কী কী তাঁর প্রাপ্য তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। একদিকে ১৭৯০ সালে নবাব শিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নিসা ব্রিটিশকর্তৃক সামান্য ভাতায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, অন্যদিকে এই ১৭৯০ সালেই পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশিত হয় মেরির লেখা প্রথম নারীবাদী গ্রন্থ *A Vindication of the Rights of Woman : With Strictures on Political and Moral Subjects*. নারীও যে পুরুষের মতোই একজন মানুষ এবং সমাজ-রাষ্ট্রপ্রদত্ত সব সুবিধা নারীরও প্রাপ্যের অধিকার রয়েছে, এটিই ছিলো মেরির লেখা আলোচ্য গ্রন্থের মূল বক্তব্য। অন্যদিকে :

> বাংলায় মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন সূচিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। এর প্রবর্তক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রায় তিন দশক সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর সমমনা কর্মীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের এই উপমহাদেশ ত্যাগ এবং এরপর পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের সময়কালের গণআন্দোলন ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়– এসবই বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে প্রগতির পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। (শাহানারা, ২০১৪, পৃ. ১৯-২০)

সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই ছিলেন নারীবাদী সাহিত্যচর্চার সোচ্চার সমর্থক। তিনি তাঁর লেখনীতে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন আলোচ্য নাটকে নবাবের অন্তঃপুরিকাদের বঞ্চনা, মনঃকষ্ট, বন্দিদশার নির্মমতার কথা তিনি উপস্থাপন করেছেন শিরাজের মাতা আমিনা চরিত্রের মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজমহলের দাসি ও পরিচারিকার জীবনযন্ত্রণার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে পায়েলি ও ডালিম চরিত্র দুটির মাধ্যমে। সমকালীন সমাজে প্রচলিত দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে ডালিম চরিত্রের সংলাপে :

> জানি না কোথায় কবে কোন দূর দেশে
> কার কোল থেকে কবে ছিন্ন করে আমাদের আনা হয়,
> তোলা হয় গোলামের হাটে।
> তারপর এসে পড়ি নবাবের জেনানা মহলে।
> আর এই জেনানা মহলই হয় একমাত্র জগত বাঁদীর।
> মহলেই নাবালিকা থেকে বালিকা–
> মহলেই যৌবন বিগত,
> একদিন মহলেই ইন্তেকাল করা।

এই জীবন বৃত্তান্তে পিতা মাতা ভাই বোন নাই– (হক, ২০১৬, পৃ. ৪১৮)

সেকালের সমাজে বিদ্যমান দাসপ্রথার নির্মম বলি মহলের বাঁদিচরিত্র ডালিম ও পায়েলি। রাজপরিবারের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মনোরঞ্জনের মাধ্যমেই অতিবাহিত হয় এদের জীবন। কিন্তু মহলের কোনোকিছু ভোগদখলের অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। দাসপ্রথার নির্মম বলি হয়ে কোন দূরদেশ থেকে এদেশে এসেছে তাও তাদের অজ্ঞাত। রাজপরিবারের সন্তান-সন্ততিরা তাদের পরিচর্যায় লালিত-পালিত হয়, কিন্তু তারা দাসীই থেকে যায় আজীবন। এমনকি যুদ্ধপরবর্তীকালে মহলের উচুঁতলার নারীরা যখন নিজেদের সম্ভ্রমরক্ষার চিন্তায় অস্থির, তখন এই দাসীদের কথা তারাও ভাবে না। হাতবদল হওয়া আর সম্ভ্রম হারানোই যেন এসকল নারীদের জীবনভাগ্য। ডালিমের কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয় ক্ষোভমিশ্রিত অভিযোগ :

খোদার পরেই
হাজির নাজির যদি জেনে থাকি আপনাকে
দেখলাম সেই আপনারাই একমাত্র নিজেদের ইজ্জতের কথা ভাবছেন।
শুধু নিজেদের! শুধু আপনার কন্যা আর পুত্রবধূটির।
কেবল তারাই নারী ? নারীধর্ম কেবল তাদেরই ?
আমাদের নারীধর্ম নাই ? কোনো নারীত্ব নাই ?
বাদীদের নেই– তাই নেই হারাবার ! (হক, ২০১৬, পৃ. ৪১৯)

মহলের নারীদের পাশাপাশি নাটকে আরেক শ্রেণির নারীর উল্লেখ করেছেন নাট্যকার, যারা নবাবমহলের নারীদের মতো অসূর্যম্পশ্যা নয়। তারা রাজপরিবারের পরিচয়ে পরিচিত না হলেও রাজপুরুষদের সম্মানে নৃত্যগীত পরিবেশন করে তাদের জীবনকে করে তুলেছিল উপভোগ্য ও আনন্দময়। বাঈজি নামেই এরা সে-সমাজে পরিচিত ছিল। জীবনযাপনে এরা ছিল অনেকটা স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী। সমাজপতি কিংবা সামন্তপ্রভুদের সঙ্গেই ছিল এদের সম্পর্ক। ফলে রাজ্য বা রাজত্বের হাতবদল হলেও এদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হতো না। যেহেতু রাজপুরুষের ভোগবিলাসে এরা ব্যবহৃত হতো, সেহেতু রাজমহলের নারীরা এদের প্রতি ছিল ঈর্ষাকাতর। মহলের নারীরা যেখানে কেবল নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করছে, সেখানে এরা রাজমহলের সম্মান ও মর্যাদাকে উচ্চাসন দিয়েছে।

অন্যদিকে, *নারীগণ* নাটকে নাট্যকার সমাজবাস্তবতার আলোকে দেখিয়েছেন যে, পুরুষের নিকট নারীর কোমল-মধুর রূপ অধিক পছন্দনীয়। ফলে তারা নারীর রূপসজ্জা, অঙ্গসজ্জায় যতটা আগ্রহী– নারীর বিদ্যার্জন কিংবা অস্ত্রশিক্ষায় ততটা আগ্রহী নয়। রাজমহলে পুত্রসন্তান শৈশব থেকেই বিভিন্ন অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দক্ষযোদ্ধা হবার পাঠ নেয়। কিন্তু কন্যাশিশুর জন্য এ অধিকার নেই। অথচ মেয়ে শিশুকেও উপযুক্ত অস্ত্রচালনায় দক্ষ করে তুললে তারা পুরুষের পাশাপাশি রাজ্যরক্ষায় অংশ নিতে পারত। অন্তত রাজ্যরক্ষা না হোক, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় তাদের এ দক্ষতা কাজে লাগাতে পারত। অবশ্য মহলের নারীরা সামান্য কিছু অস্ত্র কাছে রাখার অধিকার পেতো সম্ভ্রম

রক্ষার্থে আত্মহত্যা করার জন্য। সমাজের এই বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে আমিনা চরিত্রের একটি সংলাপে :

হায় নারীর খঞ্জর!
যুদ্ধের জন্যে তো নয়,
শত্রুর পঞ্জর বিদ্ধ করতে তো নয়,
পুরুষ যে নারীকে খঞ্জর দেয়, কেন তারা দেয় ?
আত্মহত্যা করবার জন্যেই তো, বেটি।
পুরুষেরা মনে করে, যুদ্ধে পরাজয়
তখনি সর্বাংশে হয়
যখনি নারীটি তার বিজয়ীর ভোগ্যবস্তু হয়।
তাই পরাজিত হয়েও পুরুষ চায় জয়ী হতে,
আর সেই জয় তাকে দিতে পারে একমাত্র নারী –
যদি নারী আত্মহত্যা করে! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮৬)

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষতন্ত্র স্বীকার করে নিতে পারে না, সেখানেই নারী জয়-পরাজয়ের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়। আমিনার প্রাসঙ্গিক সংলাপ উল্লেখ্য :

রাজনীতি শতরঞ্জ খেলায়
নারী তো আসলে এক সামান্যই বড়ে–
তাকেও না খেলে বুঝি কিস্তিমাৎ হয় ?
যুদ্ধের প্রান্তরে নয়, জয়-পরাজয়
নারীর শরীরে হয় নির্ধারিত– ইতিহাসের রয়েছে প্রমাণ। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮৫)

সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে দেখাতে চেয়েছেন সমাজে নারীরাও রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু কোনো পুরুষ হাতে ধরে নারীকে এ শিক্ষা দেয় না। বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নারীরা তা শিখে নেয় আপনা থেকেই। রাজনৈতিক ঘাত-সংঘাতের অনিবার্যতায় শিরাজপত্নী লুৎফার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ প্রসঙ্গে রাজমাতা আমিনার একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে :

রাজনীতি হাত ধরে শেখায় না পুরুষেরা,
শিখি নিজে নিজে, রক্তে বুক ভেসে গেলে।
আম্মা, এভাবেই আমরা নারীরা শিখি –
প্রয়োগের সুযোগ পাই না শুধু নারীজন্ম বলে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪২৩)

রাজনীতি বা রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নারীর অংশগ্রহণ নেই সেকালের সমাজে, নারী কেবল মহলের অধিবাসী, পুরুষকর্তৃক ভোগ্য নর্মসহচর। সমাজের এই অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে সিরাজ-মাতা আমিনার একটি সংলাপে :

যে কোনো যুদ্ধের এক বাস্তবতা এই–
যুদ্ধ করে পুরুষেরা।
বিজয়ী বা পরাজিত কোনো পক্ষে নারী যোদ্ধা নেই।

নারী শুধু পুরুষের নর্মসহচরী!
রমিত রমণী।
পুরুষের কাছে নারী নারীরই রন্ধনকৃত আহার্যের মতো
ভোগের সামগ্রী। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৮৪)

তৎকালীন সমাজে পুরুষের চোখে নারীর অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে সিরাজমাতা আমিনার বর্ণনায় :

নারীকে
পুরুষেরা জমি কিম্বা সম্পদের অধিক দেখে না।
এমন কি আত্মা তার আছে কিনা পুরুষের রয়েছে সংশয়।
মেধা বুদ্ধি? ও কি কথা! পুরুষের চোখে
নারী শুধু রূপবতী অথবা সে কুৎসিত কুরূপা–
মেধাবী বা বুদ্ধিমতী নয়।
শরীর চিক্কন মেদে, বুদ্ধিতে নিরেট!
যৌবনে নারীর মূল্য শয্যায় সে পরী–
বৃদ্ধকালে দাসীর অধম!
নারীরত্ন বলা হয়, রত্নের মতোই
নারীকে সিন্দুকে বন্দী করে রাখা হয়–
মানে অন্দর মহলে, প্রাচীরের ঘেরা টোপে সুরক্ষিত করে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৪)

পলাশির প্রান্তরে সিরাজের মৃত্যুর পর সামাজিক বিশৃঙ্খলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আরেকটি সংলাপে:

পুরুষ সবাই ব্যস্ত লুণ্ঠনে ও আখের গোছাতে।
রাত্রি ভোর হবার আগেই তারা কুর্নিশ করছে
রাজহত্যাকারীকেই–অতীতের আনুগত্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯২)

অন্যদিকে সমাজে অপরাজনীতির ফলে বিপন্ন মানবতার চিত্র, নারী নির্যাতনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে কুতুব চরিত্রের সংলাপে নিম্নোক্তভাবে :

জেনানা বণ্টন করে নেবে ওরা দুম্বার মাংসের মতো।
রাজনীতি ধরে যদি সন্ত্রাসের পথ,
সন্ত্রাসের পথে যদি আসে রাজনৈতিক বিজয়–
তবে সেই জয়–
পূর্ণ নয় নারীমাংসে কামড় না দিলে! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৩)

মহলের দাসী কিংবা বাঈজি শ্রেণির নারীদের প্রতি অভিজাত মহলের নারীদের কেমন ঘৃণাসূচক মানসিকতা সেটি বোঝা গেছে আমিনাকে কটাক্ষ করে তার মাতা শরিফা বেগমের একটি সংলাপে :

যেন তুই নবাব জননী নোস–
হীন ক্রীতদাসী এক বাজারের নটি!

তাই আজ তোর চোখে পুত্রবধূকেই
বাজারী কস্‌বি করে বিকোবার মতো মনে হয়! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৪)

তবে সমাজে নারীর কেবল ইতিবাচক দিকটিই থাকে না– নারীর চরিত্রেও আছে একজন মানুষের মতোই স্বার্থ, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। ঘসেটি সেই শ্রেণির নারীর প্রতিনিধি। আমিনা ঘসেটি বেগমের আলাপ প্রসঙ্গে নারী চরিত্রের এই নেতিবাচক দিকটি উল্লেখ করে বলেছে:

নারী যদি বিষময়ী হয়–
তার কাছে পুরুষও হার মানে, জানেন নিশ্চয়।
ঘসেটির বিবরণ আরো মনে করাবো কি?
স্বামী বেঁচে থাকতেই উপপতি!...
ধরে বিষ! শিরাজের শত্রুদের টেনে নেয় নিজের বিবরে,
বিষধরী ফুঁসে ওঠে, গোপনে গোপনে
মীরজাফর উমিচাঁদ রাজা রায় দুর্লভের সঙ্গে ষড় করে,
সিরাজকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করতে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৭)

নাটকে আমিনা বেগম সমাজে নারীর বঞ্চনা নিয়ে সবথেকে বেশি সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু সে নিজে তার স্বামীকে মনে করেছে অমূল্যরতন কণ্ঠহার। অর্থাৎ সে নিজে নারীর বঞ্চনার ইতিহাস উপলব্ধি করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাজার বছররের লালিত ট্যাবু অন্ধবিশ্বাস থেকে বের হতে পারেনি। আমিনা পাটনার যুদ্ধে আফগান সেনাদের হাতে মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করে বলেছে :

হীরা পান্না মরকতের হার, কত মূল্য তার?
এক লক্ষ? সোয়া লক্ষ/ কোটি লক্ষ? কোটি কোটি কোটি?
যত লক্ষ যত কোটি, অমূল্য তা নয়।
এরও মূল্যসীমা আছে যদিও বা আকাশে পৌঁছায়।
কিন্তু যে অমূল্য হার আমার ভূষণ–
অমূল্য যে কণ্ঠহার– হীরা মুক্তামানিক্যে তো গাঁথা নয়,
পাথরে তো নয়, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া,
রূপ যার আকাশের আদম সুরত–
আমি সেই স্বামী তোর শ্বশুরকে হারিয়েছি
পাটনায় এক রাষ্ট্রবিদ্রোহের কালে।...
আর কি দুঃসহ মিল, তুই তোর স্বামী হারালি যে
আরেক বিদ্রোহকালে ঘাতকের হাতে।
কণ্ঠ থেকে ছিড়ে নিয়ে গেছে তোর কণ্ঠহার। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৮)

সমকালীন বিপন্ন রাষ্ট্র আর অস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছে আমিনা নিম্নোক্ত সংলাপে :

এখনো ধর্ষক ঠোঁটে আসে না? শকুন তাই বলেছেন?
কথা নেই মুখে? ধর্ষণ নারীকে শুধু?

ধর্ষণ চলছে রাজক্ষমতার দেহে–
ধর্ষণ চলেছে নীতি আর মূল্যবোধের ওপর
আর্তনাদ শুনতে কি পান, আম্মা এতই বধির! (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৯৯)

অন্যদিকে পলাশিপরবর্তী অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থা সুস্পষ্ট হয়েছে শরীফার আরেকটি সংলাপের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে সে-সময়কার পলাশির বাস্তব অবস্থা উপস্থাপিত হলেও সবযুগের সবকালের রাজনৈতিক পালাবদলের পরবর্তীকালীন বিশৃঙ্খলার চিত্রও পরিস্ফুটিত হয়েছে। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়পরিসরে বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক সামাজিক অব্যবস্থাপনাও প্রতীকী হয়ে ধরা দিয়েছে আলোচ্য সংলাপে :

শরিফা। হস্তী পড়ে গেলে চুহা হস্তী হতে চায়! [...]
বিধর্মী, কাফের, শেঠ, বানিয়া, গোমস্তা, গোরা,
দেশবেশ্যা, নীতিবেশ্যা, ধর্মবেশ্যা, চারদিকে ওরাই এখন।
স্বর্ণলোভী ওরা। বিষ্ঠা থেকে খুঁটে যদি তুলতেও হয়,
তুলতে পিছপা নয়। ক্ষমতার লোভী!
কারণ ক্ষমতা যার স্বর্ণ তারই স্বর্ণের ভান্ডার।
অতএব রাষ্ট্রদস্যু সিংহাসন কাড়ে।
সিংহাসন পাওয়া মানে লুণ্ঠনের সুযোগ অপার। (হক, ২০১৬, পৃ. ৪২২)

আর এভাবেই নাট্যকার অতীত ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে বেঁধে নারীগণ নাটকটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। নারীবাদী সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের সূত্রকে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে অপরূপ নান্দনিকতায় উপস্থাপন করেছেন।

উপসংহার

উল্লেখ্য যে, ইতিহাসকে প্রধান অবলম্বন করে সৈয়দ হক মূলত তিনটি কাব্যনাটক রচনা করেছেন। এগুলি হলো– *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *নূরলদীনের সারাজীবন* এবং *নারীগণ*। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটিতে লেখকের অন্বিষ্ট ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে গ্রামবাংলার সাধারণ জনগণের মানস-সংকট উপস্থাপন। *নূরলদীনের সারাজীবনে* তিনি অবলম্বন করেছেন কৃষকবিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অপরদিকে *নারীগণ* নাটকটিতে তিনি পলাশির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজমহলের নারীদের জীবনাচার, রাজনৈতিক সংকট ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করার এমন দৃষ্টান্ত বাংলাকাব্যনাট্যের ইতিহাসে অভিনব, অনন্য। রাজনৈতিক ইতহাসের বাঁকবদলের এমন বাস্তব উপস্থাপনে, উপেক্ষিত নারীসমাজের মনোকথন বয়ানে, নাট্যপরিবেশনরীতির নান্দনিকতায়, ভাষাপ্রয়োগরীতির অনন্যতায় সৈয়দ শামসুল হক নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

টীকা

১. *নারীগণ* কাব্যনাটকটির খসড়া তিনি রচনা করেছেন ২০০৫ সালের অক্টোবরে লন্ডনে বসে। কিন্তু পরিপূর্ণ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তারও একবছর পর ২০০৬ সালের মে-জুন মাসে। নাটকের খসড়া রচনা ও পূর্ণাঙ্গ রচনার মধ্যবর্তী এ সময়ক্ষেপণ বলে দেয় তিনি বেশ ভাবনা চিন্তা করেই নাটকটি রচনা করেছেন। কেননা তিনি যে ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনা করতে চাইছেন, সেটি নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলায় বিস্তর রচনা রয়েছে। ফলে তিনি চেনাপথে চেনারূপে নাটক রচনা করে নাট্যগ্রন্থের সংখ্যামাত্র বাড়াতে চাননি। অর্থাৎ চেনা জিনিসে অচেনা চমক আনতেই বলা যায় তাঁর এ সময়ক্ষেপণ।

২. *মুজাফফরনামা*র রচয়িতা করম আলী তাঁর গ্রন্থে লুৎফুন্নেসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন– নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার নিহত হওয়ার পর পিতা ও পুত্র (মীরজাফর ও মীরন) উভয়েই প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলার মহিয়সী বেগম লুৎফুন্নিসার হস্তকামনা করলে তিনি তা (ঘৃণাভরে) প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, "পূর্বে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করার পর আমি এখন গর্দভের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হতে পারি না।" [দ্রষ্টব্য : যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (২০০৬)। *নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ৮৯]

৩. শিরাজদ্দৌলার জেনানামহল নিয়ে বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। প্রকৃত সত্য তথ্যের অভাবে ইতিহাসপ্রণেতারা এসব নিয়ে অনুমানভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। কেউ লিখেছেন শিরাজের দুই ভ্রাতা, কেউ লিখেছে তিন (শিরাজদ্দৌলা, একরামুদ্দৌলা, মীর্জা মেহেদী)। কেউ বলেছেন ঘসেটি শিরাজের ভাইকে নবাব করতে চেয়েছিল, কেউ লিখেছেন শিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে। কেউ লিখেছেন কর্মচারী হোসেন কুলী খাঁ এর প্রতি ঘসেটি এবং আমিনা উভয়ে অনুরক্ত ছিল ; যার কারণে জেনানা মহলে দুই বোনের মধ্যে কলহ বাঁধে। ফলে আলিবর্দীর নির্দেশে শিরাজ হোসেন কুলীকে হত্যা করে। আবার কেউ বলেছে ঘসেটির হোসেন কুলীর সাথে সম্পর্ক শুনে শিরাজ নিজ দায়িত্বে হত্যা করে তাকে আলীবর্দী খানের সম্মতি ছাড়াই। আবার, শিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নিসাকে নিয়েও নানান তথ্য রয়েছে। কেউ বলেছেন লুৎফুন্নিসা শিরাজের বিবাহিত প্রথম পত্নী ছিলেন না। শিরাজের প্রথম পত্নী ছিল মুঘল ইরেজ খানের মেয়ে বহু বেগম। ১৭৪৬ সালে আলিবর্দী খাঁ মির্জা ইরেজ খানের কন্যার সঙ্গে খুব ধুমধাম করে শিরাজের বিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানের বিলাসবহুল আড়ম্বর ছিল দেখার মতো। অন্যদিকে, লুৎফুন্নিসা ছিল শিরাজের মাতা আমিনা বেগমের হিন্দু দাসী। শিরাজ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে এবং নাম দেয় লুৎফুন্নিসা। অন্য আরেকটি সূত্র বলছে শিরাজের কাশ্মির থেকে আগত ব্রাহ্মণ সহচর মোহনলালের ভগ্নি ছিল লুৎফুন্নিসা। মোহনলাল তার সুন্দরী ভগ্নিকে বন্ধুত্বের নির্দশন হিসেবে সিরাজের নিকট স্ত্রীরূপে তুলে দেন।

৪. "সিরাজদ্দৌলা রাত্রিযোগে ত্রস্তভাবে মালদহ হইতে বড়াল নামক স্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু নাজেরপুরের মোহানা বন্ধ হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বড়ালিয়ার বড়ালের দান শাহ নামক পীরপুত্রের আবাসে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দান শাহ তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি এখন প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সিরাজকে আশা ভরসা দিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গোপনে মীর মোহাম্মদ জাফর খাঁর ভ্রাতা ও আকবর নগরের ফৌজদার দায়ুদ আলী

খাঁকে সংবাদ পাঠাইলেন।” [দ্র. চৌধুরী, সুশীল (২০১৯)। *পলাশির অজানা কাহিনী*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা । পৃ. ২২৭-২২৮]

তথ্যসূত্র

আলম, স. ম. শামসুল (২২ ডিসেম্বর, ২০১৭)। কাব্যনাট্যের কারিগর সৈয়দ শামসুল হক। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, (মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ, সম্পা.)। ঢাকা।

আলীম, এ. কে. এম. আবদুল (১৯৯৬)। *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

চৌধুরী, সুশীল (২০১৯)। *পলাশির অজানা কাহিনী*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

তুলু, আবু সাঈদ (২২ নভেম্বর, ২০১২)। মঞ্চনাটক: নারীগণ, *কালি ও কলম* (অনলাইন সংস্করণ), (আবুল হাসনাত, সম্পা.)। ঢাকা। https://www.kaliokalam.com

ফজল, রেহান (৩ জুলাই, ২০২০), নবাব সিরাজউদ্দৌলা : যার নির্মম হত্যার পর ভারতে ইংরেজদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়, *বিবিসি হিন্দি*, (অনলাইন সংস্করণ)। দিল্লি। https://www.bbc.com/bengali/news-53274597.amp

ভট্টাচার্য, মোক্ষদারঞ্জন (১৯৯৩)। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, (অনাথবন্ধু দত্ত, সম্পা.)। দ্ব্যশীতিতম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার (২০১৭)। *মীর কাসিম*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (২০০৬)। *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র (২০০৫)। *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খন্ড), (তরুণ মুখোপাধ্যায়, সম্পা.)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রায়, নিখিলনাথ (২০১৮)। *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

রায়, রজতকান্ত (২০১৪)। *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

হক, সৈয়দ শামসুল (২০১৬)। *কাব্যনাট্যসমগ্র*। চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেন, শাহানারা (২০১৪)। *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।